ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৪র্থ পত্র: উসূলুল ইফতা ওয়াল ফিকহুল মুকারান

খ বিভাগ: ফিকহুল মুকারান (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

আল ফিকহ ওয়াল ফিকহুল মাযহাবী

প্রশ্ন-০১: ফিকহের পারিভাষিক সংজ্ঞা কী? [ما هو التعريف الاصطلاحي للفقه؟]

প্রশ্ন-০২: ফিকহের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ কর। [اذكر موضوع الفقه بإيجاز.]

প্রশ্ন-০৩: ফিকহ অধ্যয়নের মৌলিক উদ্দেশ্য কী? [ما هو الغرض الأساسي من دراسة الفقه؟]

প্রশ্ন-০৪: ইসলামী শরীয়তে ফিকহের শ্রেষ্ঠত্ব কী? [ما هي فضيلة الفقه في الشريعة الإسلامية؟]

প্রশ্ন-০৫: 'আল-ফিকহুল মাযহাবী'-এর সংজ্ঞা কী? [ما هو تعريف "الفقه المذهبي"؟]

প্রশ্ন-০৬: ফিকহের নির্ভরযোগ্য মূলনীতিগুলোর মধ্যে দুটি মূলনীতি উল্লেখ কর। [اذكر اثنين من أهم أصول الفقه المعتمدة.]

প্রশ্ন-০৭: বিধি-বিধান উদ্ভাবনে কোনো একজন ইমামের পদ্ধতির একটি উদাহরণ উল্লেখ কর। [اضرب مثالا واحدا لمنهج أحد الأئمة في استنباط الأحكام.]

প্রশ্ন-০৮: ফিকহুল মাযহাবী কখন সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ও প্রসার লাভ করে? [متى بدأ الفقه المذهبي في التبلور والانتشار؟]

প্রশ্ন-০৯: ফিকহ ও উসূল ফিকহের মধ্যে পার্থক্য কী? [ما هو الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟]

প্রশ্ন-১০: ফিকহের অপরিহার্য বিষয়সমূহ (দরুরিয়াত) অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? [ما هي أهمية دراسة الضروريات الفقهية؟]

আল ফিকহুল মুকারান

প্রশ্ন-১১: 'আল-ফিকহুল মুকারান'-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। [عرف "الفقه المقارن" لغة واصطلاحا.]
প্রশ্ন-১২: তুলনামূলক ফিকহ ও মাযহাবী ফিকহের মধ্যে মূল পার্থক্য কী? [ما هو الفرق الجوهري بين الفقه المقارن والفقه المذهبي؟]
প্রশ্ন-১৩: তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের মৌলিক লক্ষ্য কী? [ما هو الهدف الأساسي من دراسة الفقه المقارن؟]
প্রশ্ন-১৪: আলেমদের মতপার্থক্য অধ্যয়নের একটি উপকারিতা উল্লেখ কর। [اذكر فائدة واحدة من دراسة اختلاف العلماء.]
প্রশ্ন-১৫: তুলনামূলক ফিকহ কীভাবে ইসলামী ঐক্যের সেবা করে? [كيف يخدم الفقه المقارن الوحدة الإسلامية؟]
প্রশ্ন-১৬: তুলনামূলক ফিকহের সমৃদ্ধি ও লিপিবদ্ধকরণের যুগ কখন ছিল? [متى كانت مرحلة الازدهار والتدوين في الفقه المقارن؟]
প্রশ্ন-১৭: মাযহাবের বহুত্বের প্রভাব তুলনামূলক ফিকহ বিজ্ঞানের ওপর কী? [ما هو أثر التعدد المذهبي على علم الفقه المقارن؟]
প্রশ্ন-১৮: মধ্যযুগে তুলনামূলক ফিকহের সবচেয়ে প্রধান লেখকের নাম উল্লেখ কর। [اذكر أبرز مؤلف في الفقه المقارن في العصور الوسطى.]
প্রশ্ন-১৯: তুলনামূলক ফিকহে আলেমদের দলীল অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? [ما هي أهمية دراسة أدلة العلماء في الفقه المقارن؟]
প্রশ্ন-২০: তুলনামূলক ফিকহে অনুসৃত পদ্ধতি কী? [ما هو المنهج المتبع في الفقه المقارن؟]

তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার পদ্ধতি

প্রশ্ন-২১: তুলনামূলক ফিকহে গবেষণার পদ্ধতির প্রথম ধাপ কী? [ما هي أول خطوة في طريقة البحث في الفقه المقارن؟]
প্রশ্ন-২২: 'তাসভীরুল মাসআলাহ' (মাসআলার চিত্রায়ণ) বলতে কী বোঝানো হয়? [ماذا يقصد بـ"تصوير المسألة"؟]
প্রশ্ন-২৩: 'তাহরীরু মাহাল্লিন নিযা' (বিরোধের স্থান স্পষ্টকরণ)-এর অর্থ কী? [ما معنى "تحرير محل النزاع أو الخلاف"؟]

প্রশ্ন-২৪: তুলনামূলক গবেষণায় মতপার্থক্যের উৎস (মানশা'উল খিলাফ) বর্ণনার গুরুত্ব কী? [ما هي أهمية بيان منشأ الخلاف في البحث المقارن؟]
প্রশ্ন-২৫: আলেমদের মতামত ও তাদের দলীল বর্ণনায় কী কী অন্তর্ভুক্ত থাকে? [ماذا يشمل بيان آراء العلماء وأدلتهم؟]
প্রশ্ন-২৬: তুলনামূলক ফিকহে মুনাক্বশা (পর্যালোচনা)-এর গুরুত্ব কী? [ما هي أهمية "المناقشة" في الفقه المقارن؟]
প্রশ্ন-২৭: 'আত-তারজীহ' (অগ্রাধিকার প্রদান) বলতে কী বোঝানো হয়? [ماذا يقصد بـ"الترجيح"؟]
প্রশ্ন-২৮: ইবনে রুশদ-এর তুলনামূলক ফিকহের প্রধান কিতাবের নাম উল্লেখ কর। [اذكر اسم أبرز كتاب في الفقه المقارن لابن رشد.]
প্রশ্ন-২৯: 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' কিতাবের পদ্ধতি কী? [ما هي منهجية كتاب "بداية المجتهد"؟]
প্রশ্ন-৩০: তুলনামূলক ফিকহের একটি আধুনিক কিতাবের নাম উল্লেখ কর। [اذكر كتابا حديثا في الفقه المقارن.]

ফিকহী মাযহাবসমূহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ

প্রশ্ন-৩১: ফিকহী মাযহাবের 'নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ' কী কী? [ما هي "الكتب المعتمدة" في المذهب الفقهي؟]
প্রশ্ন-৩২: হানাফী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদাহরণ দাও। [اذكر مثالا لكتاب معتمد في المذهب الحنفي.]
প্রশ্ন-৩৩: মালেকী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদাহরণ দাও। [اذكر مثالا لكتاب معتمد في المذهب المالكي.]
প্রশ্ন-৩৪: 'ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ' কী কী? [ما هي "مصطلحات المذاهب الفقهية"؟]
প্রশ্ন-৩৫: হানাফী পরিভাষা 'আল-আসাহ'-এর অর্থ কী? [ما معنى المصطلح الحنفي "الأصح"؟]
প্রশ্ন-৩৬: শাফি'ঈ মাযহাবে 'আল-মুতামাদ' পরিভাষাটির তাৎপর্য কী? [ما دلالة المصطلح "المعتمد" في المذهب الشافعي؟]

আল ফিকহ ওয়াল ফিকহুল মাযহাবী

প্রশ্ন-০১: ফিকহের পারিভাষিক সংজ্ঞা কী? (ما هو التعريف الاصطلاحي للفقه؟)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো ফিকহ। উসূলবিদ ও ফকীহগণের মতে ফিকহের একটি সুনির্দিষ্ট ও জামে (পূর্ণাঙ্গ) সংজ্ঞা রয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): অধিকাংশ উসূলবিদের মতে ফিকহের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো:

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ(অর্থ: বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ থেকে অর্জিত শরীয়তের আমল বা কাজ সম্পর্কিত বিধানাবলীর জ্ঞানকে ফিকহ বলে।)

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: ১. আল-ইলম (জ্ঞান): এখানে ফিকহ বলতে কেবল ধারণা নয়, বরং নিশ্চিত জ্ঞান বা প্রবল ধারণাকে বোঝানো হয়েছে। ২. **আল-আহকাম আশ-শারইয়্যাহ (শরয়ী বিধান):** এর মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিধান (যেমন—আগুন গরম) বাদ দেওয়া হয়েছে। ফিকহ কেবল আল্লাহর দেওয়া বিধান আলোচনা করে। ৩. **আল-আমালিয়্যাহ (আমল বা কাজ):** এর মাধ্যমে আকিদা বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। ফিকহ কেবল মানুষের বাহ্যিক আমল (যেমন—নামাজ, রোজা, ক্রয়-বিক্রয়) নিয়ে আলোচনা করে। ৪. **আল-মুকতাসাব (অর্জিত):** অর্থাৎ ইজতেহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে এই জ্ঞান অর্জিত হতে হয়। ৫. **আদিল্লাতুহা অত-তাফসিলিয়্যাহ (বিস্তারিত দলিল):** কুরআনের নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদিস থেকে বিধান বের করা।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সংজ্ঞা: ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহের ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন:

الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا(অর্থ: ফিকহ হলো নফসের (আত্মার) জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো জানা।) প্রাথমিক যুগে ফিকহ বলতে ঈমান, আমল ও আখলাক সবকিছুর সমষ্টিকে বোঝাত। তবে পরবর্তীতে এটি কেবল ফিকহী বা আমলী মাসায়েল হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন-০২: ফিকহের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (اذكر موضوع الفقه بإيجاز.)

উত্তর: যেকোনো শাস্ত্রের 'মওযু' বা বিষয়বস্তু হলো সেই জিনিস, যার সম্পর্কে ওই শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। ইলমুল ফিকহের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক এবং এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে স্পর্শ করে।

ফিকহের বিষয়বস্তু (موضوع الفقه): ফিকহ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো:

فِعْلُ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ(অর্থ: হালাল-হারাম, সহীহ-শুদ্ধ ও ফাসেদ বা বাতিল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে মুকাল্লাফ বা শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ।)

বিষয়বস্তুর বিভাজন: ফকিহগণ ফিকহের আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন:

১. **ইবাদত (العبادات):** বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্কের বিষয়াবলী। যেমন— তাহারাত (পবিত্রতা), সালাত (নামাজ), সাওম (রোজা), হজ ও যাকাত। ফিকহ এখানে শেখায় কীভাবে আল্লাহর হক আদায় করতে হয় এবং ইবাদতের শর্ত ও রুকনগুলো কী কী।

২. **মুআমালাত (المعاملات):** মানুষে-মানুষে লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ক। যেমন— ক্রয়-বিক্রয় (বাই), ভাড়া (ইজারা), বন্ধক (রাহন), অংশীদারিত্ব (শিরকাত) এবং আমানত। এখানে হালাল উপার্জনের পদ্ধতি ও অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. **মুনা কাহাত (المناكحات):** পারিবারিক জীবন ও বংশরক্ষা সংক্রান্ত বিধান। যেমন— বিবাহ (নিকাহ), তালাক, খোরপোষ (নাকাফাহ), এবং সন্তানের লালন-পালন (হাযানাত)।

৪. **উকুবাত বা জিনায়াত (العقوبات):** অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধান। যেমন— কিসাস (প্রতিশোধ), হুদুদ (নির্ধারিত শাস্তি), এবং বিচার ব্যবস্থা। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অপরাধীর কী শাস্তি হবে, তা ফিকহ নির্ধারণ করে।

সুতরাং, মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত কাজ (আমল) আছে, তার শরয়ী হুকুম বর্ণনা করাই ফিকহের বিষয়বস্তু।

প্রশ্ন-০৩: ফিকহ অধ্যয়নের মৌলিক উদ্দেশ্য কী? (ما هو الغرض الأساسي من دراسة الفقه؟)

উত্তর: ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখারই একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। ইলমুল ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান অর্জন বা পাণ্ডিত্য জাহির করা নয়, বরং এর পেছনে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

ফিকহ অধ্যয়নের মৌলিক উদ্দেশ্য (الغرض الأساسي): ফিকহবিদগণ ফিকহ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মুক্তি (الفوز بسعادة الآخرة): ফিকহ অধ্যয়নের প্রধান ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর হুকুম বা বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তা পালন করা।

- একজন মুমিন কীভাবে নামাজ পড়লে আল্লাহ খুশি হবেন, কীভাবে রোজা রাখলে তা কবুল হবে—তা ফিকহ শিক্ষা দেয়।
- সঠিক আমলের মাধ্যমেই বান্দা জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভ করতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিকহ দান করেন।"

২. ইহলৌকিক কল্যাণ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন (صلاح الدنيا): ফিকহ কেবল পরকালের জন্য নয়, দুনিয়ার জীবনের জন্যও অপরিহার্য।

- **ব্যক্তিগত জীবন:** ফিকহ মানুষকে হালাল-হারামের পার্থক্য শেখায়, যা তাকে পবিত্র জীবনযাপনে সাহায্য করে।
- **সামাজিক শান্তি:** পারস্পরিক লেনদেন, বিবাহ-শাদী এবং বিচার ব্যবস্থার সঠিক নিয়ম জানা থাকলে সমাজে বিবাদ কমে যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **অধিকার রক্ষা:** কার সম্পদে কার কতটুকু হক (যেমন—মিরাস বা উত্তরাধিকার), তা ফিকহ নির্ধারণ করে দেয়। ফলে কেউ অন্যের হক নষ্ট করতে পারে না।

সারকথা: ফিকহ অধ্যয়নের সারসংক্ষেপ হলো **"আল-ফাওযু বি-সাআদাতিদ দারাইন"** (উভয় জাহানের সৌভাগ্য লাভ করা)। আল্লাহর বিধান মেনে দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করা এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই এর মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন-০৪: ইসলামী শরীয়তে ফিকহের শ্রেষ্ঠত্ব কী? (ما هي فضيلة الفقه في الشريعة الإسلامية؟)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তে ইলমুল ফিকহ বা ফিকহ শাস্ত্রের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে। কুরআন ও সুন্নাহয় 'ফিকহ' বা দ্বীনের গভীর বুঝ অর্জনকারীদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। এটি নবুওয়তের ইলমের উত্তরাধিকার এবং উম্মাহর পথপ্রদর্শক।

ফিকহের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযিলত (فضيلة الفقه):

১. আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ(অর্থ: আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিকহ (গভীর জ্ঞান) দান করেন। —বুখারী ও মুসলিম) এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ফিকহ অর্জন করা আল্লাহ তাআলার বিশেষ ভালোবাসার লক্ষণ।

২. ইবাদতকারীর চেয়ে ফকিহের শ্রেষ্ঠত্ব: নফল ইবাদতের চেয়ে ফিকহী জ্ঞান অর্জন করা বেশি মর্যাদাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ(অর্থ: একজন ফকিহ শয়তানের জন্য হাজার ইবাদতকারীর চেয়েও কঠোর। —তিরমিযি) কারণ, একজন মূর্খ ইবাদতকারীকে শয়তান সহজেই ধোঁকা দিতে পারে বা বিদআতে লিপ্ত করতে পারে। কিন্তু একজন ফকিহ হালাল-হারাম ও শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাই তাকে পথভ্রষ্ট করা কঠিন।

৩. সঠিক আমলের ভিত্তি: ফিকহ ছাড়া আমল বা ইবাদত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি ফিকহ জানে না, সে না জেনেই

হারামে লিপ্ত হতে পারে।" নামাজ, রোজা সহীহ হওয়ার জন্য ফিকহের জ্ঞান অপরিহার্য।

৪. উম্মাহর নেতৃত্ব: ফকিহগণ হলেন উম্মাহর ও শরীয়তের রক্ষক। তাঁরা নতুন নতুন সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধান দিয়ে ইসলামকে যুগোপযোগী রাখেন। সাহাবায়ে কেরামের যুগেও যাঁরা ফকিহ ছিলেন (যেমন— ইবনে মাসউদ, আয়েশা রা.), তাঁরা অন্যদের চেয়ে বেশি সম্মানের পাত্র ছিলেন।

সুতরাং, ইলমুল ফিকহ হলো দ্বীনের মেরুদণ্ড। এর মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম জানা ও মানা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-০৫: 'আল-ফিকহুল মাযহাবী'-এর সংজ্ঞা কী? (ما هو تعريف "الفقه المذهبي"؟)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের ইতিহাসে 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' একটি বিশেষ অধ্যায়। সাহাবা ও তাবেয়ীনদের যুগের পর ইজতেহাদের ভিন্নতার কারণে যে সুশৃঙ্খল ফিকহী ধারাগুলো তৈরি হয়েছে, তাকেই মাযহাবী ফিকহ বলা হয়।

আভিধানিক অর্থ: আরবি 'মাযহাব' (مَذْهَب) শব্দটি 'যাহাব' (ذَهَبَ) ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ যাওয়া বা গমন করা। আভিধানিক অর্থে মাযহাব মানে— চলার পথ, মত, বিশ্বাস বা পদ্ধতি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): পরিভাষায় 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' হলো:

هُوَ مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ مَخْصُوصٌ وَفْقَ أُصُولٍ وَقَوَاعِدَ مُعَيَّنَةٍ(অর্থ: সুনির্দিষ্ট নীতিমালা (উসূল) ও কায়দার আলোকে কোনো বিশেষ মুজতাহিদ ইমাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে যে শরয়ী বিধানাবলী (আহকাম) বের করেছেন, তার সমষ্টিকে ফিকহুল মাযহাবী বলা হয়।)

ব্যাখ্যা: সহজ কথায়, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় যখন কোনো নির্দিষ্ট ইমামের (যেমন— ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী রহ.) গবেষণা পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে একটি স্বতন্ত্র ফিকহী স্কুল বা ধারা গড়ে ওঠে, তখন তাকে 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' বলে।

ফিকহ ও মাযহাবী ফিকহের পার্থক্য: সাধারণ 'ফিকহ' বলতে সামগ্রিকভাবে শরীয়তের জ্ঞান বোঝায়। আর 'মাযহাবী ফিকহ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো ইমামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সেই জ্ঞানের চর্চাকে বোঝায়। যেমন— হানাফি ফিকহ, শাফেয়ী ফিকহ, মালেকী ফিকহ ও হাম্বলী ফিকহ।

গুরুত্ব: আল-ফিকহুল মাযহাবী সাধারণ মানুষের জন্য দ্বীন পালন সহজ করে দিয়েছে। কারণ সবার পক্ষে সরাসরি কুরআন-হাদিস থেকে বিধান বের করা (ইজতেহাদ) সম্ভব নয়। মাযহাবী ফিকহ তাদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও পরীক্ষিত পথ তৈরি করে দিয়েছে।

প্রশ্ন-০৬: ফিকহের নির্ভরযোগ্য মূলনীতিগুলোর মধ্যে দুটি মূলনীতি উল্লেখ কর। (اذكر اثنين من أهم أصول الفقه المعتمدة.)

উত্তর: ফিকহ বা শরীয়তের বিধানাবলী আকাশ থেকে এমনি এমনি নাজিল হয়নি, বরং এগুলো নির্দিষ্ট কিছু উৎস বা দলিল থেকে বের করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ইমাম একমত যে, শরীয়তের মূল উৎস চারটি: কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এর মধ্যে প্রধান দুটি মূলনীতি বা উৎস নিচে আলোচনা করা হলো।

১. আল-কুরআন (القرآن الكريم): শরীয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটি আল্লাহর কালাম, যা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর ওপর নাজিল হয়েছে।

- **মর্যাদা:** ফিকহের যেকোনো মাসআলায় সবার আগে কুরআনের দিকে তাকাতে হয়। যদি কুরআনে কোনো বিধান স্পষ্ট থাকে (যেমন— নামাজ কায়েম কর, সুদ বর্জন কর), তবে অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এটি 'কাতয়ী' বা অকাট্য দলিল।
- **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন, "তোমাদের জন্য ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা: ২৭৫)। এখান থেকে ফিকহবিদগণ ব্যবসার বৈধতা ও সুদের অবৈধতার মূলনীতি গ্রহণ করেছেন।

২. আস-সুন্নাহ (السنة النبوية): কুরআনের পরেই দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ। সুন্নাহ বলতে রাসূল (সা.)-এর কথা (কওলী), কাজ (ফেয়লী) এবং সমর্থন (তাকরিরী)-কে বোঝায়।

- **মর্যাদা:** সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআনে অনেক হুকুম সংক্ষেপে এসেছে (যেমন— নামাজ পড়), সুন্নাহ তার বিস্তারিত নিয়ম শিখিয়েছে (যেমন— রুকু, সিজদা, রাকাত সংখ্যা)। ইমামগণ সুন্নাহ ছাড়া ফিকহ রচনা করতে পারেন না।
- **উদাহরণ:** কুরআনে বলা হয়েছে "চোরের হাত কেটে দাও"। কিন্তু কতটুকু সম্পদ চুরি করলে এবং হাতের কোন অংশ কাটতে হবে—তা হাদিস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

এই দুটি হলো 'আসল' বা মূল ভিত্তি। বাকি দুটি (ইজমা ও কিয়াস) এই দুটির ওপর নির্ভর করেই গঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন-০৭: বিধি-বিধান উদ্ভাবনে কোনো একজন ইমামের পদ্ধতির একটি উদাহরণ উল্লেখ কর। (اضرب مثالا واحدا لمنهج أحد الأئمة في استنباط الأحكام.)

উত্তর: চার মাযহাবের ইমামগণের লক্ষ্য এক হলেও কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করার পদ্ধতি বা 'মানহাজ' (Methodology)-এ কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এখানে হানাফি মাযহাবের প্রবর্তক ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইজতেহাদী পদ্ধতির একটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পদ্ধতি (منهج الإمام أبي حنيفة): ইমাম আবু হানিফা (রহ.) নিজেই তাঁর বিধান উদ্ভাবনের ক্রমধারা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

"আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে বিধান গ্রহণ করি। যদি সেখানে না পাই, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ গ্রহণ করি। যদি সেখানেও না পাই, তবে সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া গ্রহণ করি। তাঁদের মধ্যে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ করি, কিন্তু তাঁদের মতের বাইরে যাই না। এরপর যদি বিষয়টি তাবেয়ীনদের যুগে আসে, তবে তাঁরা যেমন ইজতেহাদ করেছেন, আমিও তেমন ইজতেহাদ করি (অর্থাৎ কিয়াস করি)।"

উদাহরণ ও প্রয়োগঃ

- **খবরে ওয়াহিদ ও কিয়াসের ব্যবহারঃ** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো, যদি কোনো হাদিস 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) হয় এবং তা কুরআনের সাধারণ (আম) আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে তিনি কুরআনের আয়াতকে প্রাধান্য দেন।

- **নামাজে কিরাতঃ** কুরআনে বলা হয়েছে, "কুরআন থেকে যা সহজ হয় পড়" (ফাকরাউ মা তায়াসসারা)। এটি সাধারণ নির্দেশ। একটি খবরে ওয়াহিদ হাদিসে আছে, "সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয় না"। ইমাম শাফেয়ী হাদিসের ভিত্তিতে ফাতিহা পড়া 'ফরজ' বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা কুরআনের আয়াতের ওপর আমল করে বলেন, যেকোনো অংশ পড়া 'ফরজ', আর হাদিসের ওপর আমল করে ফাতিহা পড়াকে 'ওয়াজিব' বলেন।

- **ইস্তিহসানঃ** এছাড়া তিনি 'কিয়াস' (যুক্তি) প্রয়োগের পর যদি দেখেন যে এতে মানুষের কষ্ট হচ্ছে, তবে তিনি সূক্ষ্ম যুক্তির ভিত্তিতে 'ইস্তিহসান' (জনকল্যাণ) গ্রহণ করেন। এটি তাঁর পদ্ধতির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন-০৮: ফিকহুল মাযহাবী কখন সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে ও প্রসার লাভ করে? (متى بدأ الفقه المذهبي في التبلور والانتشار؟)

উত্তরঃ ফিকহুল মাযহাবী বা মাযহাবভিত্তিক ফিকহ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে। এর বিকাশকে মূলত হিজরি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে চিহ্নিত করা যায়।

সুনির্দিষ্ট আকার ধারণের সময়কাল (Tadwin Period): ফিকহ সংকলন ও মাযহাব গঠনের স্বর্ণযুগ বলা হয় হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সময়কালকে।

- **দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীঃ** এ সময় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) [মৃত্যু ১৫০ হি.] কুফায় এবং ইমাম মালিক (রহ.) [মৃত্যু ১৭৯ হি.] মদিনায় তাঁদের ফিকহী দরস ও ফতোয়া প্রদানের মজলিস কায়েম করেন। ইমাম আবু হানিফা তাঁর ৪০ জন ছাত্র নিয়ে একটি 'ফিকহী বোর্ড' গঠন করেন,

যেখানে প্রতিটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হতো এবং সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হতো। এটিই ছিল মাযহাবী ফিকহের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা।

- **তৃতীয় হিজরি শতাব্দী:** এ সময় ইমাম শাফেয়ী (রহ.) [মৃত্যু ২০৪ হি.] ফিকহের মূলনীতি বা উসূলে ফিকহ লিখে ফিকহকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেন। এরপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [মৃত্যু ২৪১ হি.]-এর মাধ্যমে হাম্বলী মাযহাবের সূচনা হয়।

প্রসার লাভের কারণ: ১. কিতাব সংকলন (Tadwin): ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা', ইমাম শাফেয়ীর 'আল-উম্ম' এবং ইমাম মুহাম্মদের 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর কিতাবগুলো ফিকহকে লিখিত রূপ দেয়। ২. **ছাত্রদের ভূমিকা:** ইমামদের ছাত্ররা (যেমন— ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ) সরকারি বিচারকের পদ গ্রহণ করায় এবং বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় মাযহাবগুলো প্রসার লাভ করে। ৩. **বিচার ব্যবস্থা:** আব্বাসীয় খেলাফতকালে হানাফি ফিকহকে রাষ্ট্রের বিচারিক আইন হিসেবে গ্রহণ করায় এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

সুতরাং, সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগের ব্যক্তিগত ইজতেহাদ হিজরি ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে এসে সুশৃঙ্খল 'মাযহাব' বা ফিকহী স্কুল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রশ্ন-০৯: ফিকহ ও উসূল ফিকহের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما هو الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ফিকহ' এবং 'উসূলে ফিকহ'-এর পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত জরুরি। যদিও দুটি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তবুও তাদের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ভিন্ন।

পার্থক্যসমূহ (الفرق):

১. সংজ্ঞা ও প্রকৃতির দিক থেকে:

- **ফিকহ (الفقه):** এটি হলো শরীয়তের ব্যবহারিক বিধানাবলীর জ্ঞান। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হালাল-হারাম সম্পর্কে জানা। এটি হলো 'ফলাফল' বা 'ফল' (Fruit)।

- **উসূলে ফিকহ (أصول الفقه):** এটি হলো সেই নীতিমালা বা পদ্ধতির জ্ঞান, যার মাধ্যমে দলিল থেকে ফিকহ বের করা হয়। এটি হলো 'পদ্ধতি' বা 'শিকড়' (Roots)।

২. বিষয়বস্তুর দিক থেকে:

- **ফিকহের বিষয়বস্তু:** মুকাল্লাফ বা মানুষের কাজ (আমল)। যেমন— নামাজ পড়া ফরজ, সুদ খাওয়া হারাম। এখানে নির্দিষ্ট বিধান আলোচনা করা হয়।
- **উসূলে ফিকহের বিষয়বস্তু:** শরীয়তের দলিলসমূহ (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) এবং বিধান বের করার নিয়ম। যেমন— "আমর (আদেশ) কি ওয়াজিব হওয়া বোঝায় নাকি মুস্তাহাব?"—এটি উসূলের আলোচনা।

৩. উদ্দেশ্যের দিক থেকে:

- **ফিকহের উদ্দেশ্য:** সরাসরি আমল করা এবং আল্লাহর হুকুম পালন করা।
- **উসূলে ফিকহের উদ্দেশ্য:** মুজতাহিদকে সঠিক বিধান বের করতে সাহায্য করা এবং বিধানের উৎস সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি জানতে চায় "নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম কী?"—এটি ফিকহের প্রশ্ন। আর একজন গবেষক জানতে চান "রাসূলের আদেশ (আমর) দ্বারা কি সবসময় ফরজ প্রমাণিত হয়?"—এটি উসূলে ফিকহের প্রশ্ন।

সংক্ষেপে, উসূল হলো ফিকহ তৈরির মেশিন বা ফর্মুলা, আর ফিকহ হলো সেই মেশিনের উৎপাদিত পণ্য।

প্রশ্ন-১০: ফিকহের অপরিহার্য বিষয়সমূহ (দরুরিয়াত) অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? (ما هي أهمية دراسة الضروريات الفقهية؟)

উত্তর: ইসলামে জ্ঞানার্জন করা ফরজ। তবে ফিকহের বিশাল ভাণ্ডারের সবটুকু জানা সবার জন্য ফরজ নয়। শরীয়ত প্রত্যেক মুসলমানের ওপর 'ফরজে আইন'

হিসেবে ফিকহের কিছু অপরিহার্য বিষয় বা 'দরুরিয়াত' (الضروريات) নির্ধারণ করে দিয়েছে। এগুলো অধ্যয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দরুরিয়াত অধ্যয়নের গুরুত্ব (أهمية دراسة الضروريات):

১. ফরজে আইন আদায়: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।" এখানে জ্ঞান বলতে মূলত হালাল-হারাম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ফিকহের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন— অজু, নামাজ ও রোজার মাসায়েল। এগুলো না জানলে মুসলমান গুনাহগার হবে।

২. ইবাদত শুদ্ধ হওয়া: সঠিক নিয়ম না জানলে ইবাদত বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন— অজুর ফরজ কয়টি বা কী করলে রোজা ভেঙ্গে যায়—এই অপরিহার্য ফিকহ না জানলে সারাজীবন ইবাদত করেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

৩. হারাম থেকে বেঁচে থাকা: ব্যবসা, চাকরি বা দৈনন্দিন জীবনে হালাল-হারাম চেনার জন্য ফিকহের অপরিহার্য জ্ঞান দরকার। হযরত উমর (রা.) বলতেন, "যে ব্যবসার মাসায়েল জানে না, সে যেন আমাদের বাজারে ব্যবসা না করে।" কারণ অজ্ঞতা মানুষকে সুদের মতো হারামে লিপ্ত করে।

৪. পারিবারিক শান্তি: বিবাহ, তালাক ও স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল না জানলে সংসারে অশান্তি হয় এবং অনেকে না জেনেই হারাম সম্পর্কে লিপ্ত হয়।

সাধারণ নিয়ম: ফিকহী কায়দা হলো:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ(অর্থ: যার মাধ্যমে ওয়াজিব আদায় সম্পন্ন হয়, তা অর্জন করাও ওয়াজিব।)

সুতরাং, একজন মুসলমান মুফতি না হলেও তাকে অবশ্যই 'সচেতন মুসলিম' হতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যেটুকু ফিকহ জানা প্রয়োজন (দরুরিয়াত), তা অর্জন করা ছাড়া পরকালীন মুক্তি অসম্ভব।

আল ফিকহুল মুকারান

প্রশ্ন-১১: 'আল-ফিকহুল মুকারান'-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। (عرف "الفقه المقارن" لغة واصطلاحا.)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তের গবেষণার জগতে 'আল-ফিকহুল মুকারান' একটি উচ্চতর ও আধুনিক শাখা। এটি মুজতাহিদ ইমামগণের মতপার্থক্য ও দলীল পর্যালোচনার বিজ্ঞান।

১. আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'আল-ফিকহ' (الْفِقْهُ) অর্থ গভীর জ্ঞান বা অনুধাবন। আর 'আল-মুকারান' (الْمُقَارَن) শব্দটি 'কারানা' (قَرَنَ) ধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ একত্রিত করা (Join), তুলনা করা (Compare) বা পাশাপাশি রাখা। আভিধানিক অর্থে, একাধিক বস্তুকে বা মতকে পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যে তুলনা করাকে ফিকহুল মুকারান বলে।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফকিহ ও গবেষকদের পরিভাষায় আল-ফিকহুল মুকারান হলো:

جَمْعُ الْآرَاءِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَالْمُوَازَنَةُ بَيْنَ أَدِلَّتِهَا لِبَيَانِ الرَّاجِحِ مِنْهَا(অর্থ: একই মাসআলায় ফকিহগণের বিভিন্ন মতামত একত্রিত করা এবং তাঁদের দলিলেগুলোর মধ্যে তুলনা (মুওয়াজানা) ও পর্যালোচনা করে শক্তিশালী বা অগ্রাধিকারযোগ্য (রাজিহ) মতটি স্পষ্ট করার নাম ফিকহুল মুকারান।)

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: এই সংজ্ঞায় তিনটি মূল কাজ অন্তর্ভুক্ত:

- **মতামত সংগ্রহ:** হানাফি, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীসহ বিভিন্ন মাযহাবের ইমামদের মত একত্রিত করা।
- **দলীল যাচাই:** প্রতিটি মতের সপক্ষে কুরআন, সুন্নাহ ও কিয়াসের দলীলগুলো যাচাই করা।
- **তারজীহ বা সিদ্ধান্ত:** দলীলের ভিত্তিতে কোন মতটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ, তা নির্ধারণ করা।

সুতরাং, অন্ধ অনুকরণ না করে দলীলের আলোকে সত্য উদঘাটন করাই এর মূল পরিচয়।

প্রশ্ন-১২: তুলনামূলক ফিকহ ও মাযহাবী ফিকহের মধ্যে মূল পার্থক্য কী? (ما هو الفرق الجوهري بين الفقه المقارن والفقه المذهبي؟)

উত্তর: 'আল-ফিকহুল মুকারান' (তুলনামূলক ফিকহ) এবং 'আল-ফিকহুল মাযহাবী' (মাযহাবী ফিকহ)—উভয়ই ইসলামী আইনের অংশ হলেও তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

মূল পার্থক্যসমূহ (الفرق الجوهري):

১. সংজ্ঞাগত ও পদ্ধতিগত পার্থক্য:

- **ফিকহুল মাযহাবী:** এটি একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের (যেমন— হানাফি বা শাফেয়ী) উসূল বা মূলনীতি মেনে বিধান জানা ও মানার নাম। এখানে গবেষক বা মুফতির লক্ষ্য থাকে নিজ ইমামের মাযহাবটি সংরক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া। তিনি সাধারণত অন্য মাযহাবের দলিল খোঁজেন না।

- **ফিকহুল মুকারান:** এখানে কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের গণ্ডি থাকে না। গবেষক সকল মাযহাবের মতামত ও দলিল সামনে রাখেন এবং নিরপেক্ষভাবে তুলনা (মুওয়াজানা) করেন। তার পদ্ধতি হলো দলীলের অনুসরণ, ব্যক্তির অনুসরণ নয়।

২. উদ্দেশ্যের পার্থক্য:

- **ফিকহুল মাযহাবী:** এর উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষকে আমল করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পথ দেখানো। এর মাধ্যমে 'মুকাল্লিদ' (অনুসারী) তৈরি হয়।

- **ফিকহুল মুকারান:** এর উদ্দেশ্য হলো সত্য বা হকের অনুসন্ধান করা এবং দলীলের ভিত্তিতে শক্তিশালী মতটি (রাজিহ) গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে 'মুজতাহিদ' বা গবেষক তৈরি হয়।

৩. ফলাফল: মাযহাবী ফিকহে পক্ষপাতিত্বের (Ta'assub) আশঙ্কা থাকে, কিন্তু তুলনামূলক ফিকহে মন উদার হয় এবং সংকীর্ণতা দূর হয়। মাযহাবী ফিকহ তাকলীদের শিক্ষা দেয়, আর তুলনামূলক ফিকহ ইজতেহাদ বা গবেষণার শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন-১৩: তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের মৌলিক লক্ষ্য কী? (ما هو الهدف الأساسي من دراسة الفقه المقارن؟)

উত্তর: আধুনিক যুগে ইসলামী আইন গবেষণায় তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এর পেছনে একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজ করে, যা শিক্ষার্থীকে একজন প্রজ্ঞাবান আলেমে পরিণত করে।

মৌলিক লক্ষ্যসমূহ (الأهداف الأساسية):

১. সত্যের অনুসন্ধান (الوصول إلى الحق): তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়নের প্রধান লক্ষ্য হলো দলীলের আলোকে আল্লাহর বিধানের সঠিক রূপটি খুঁজে বের করা। সব মুজতাহিদ সওয়াব পাবেন, কিন্তু সবার মত সঠিক নাও হতে পারে। বিভিন্ন ইমামের দলিলগুলো পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে গবেষক বুঝতে পারেন কার দলীলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর প্রতিফলন বেশি ঘটেছে। এর মাধ্যমে 'রাজিহ' বা শক্তিশালী মত গ্রহণ করা সহজ হয়।

২. সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূরীকরণ (إزالة التعصب): অনেকে মনে করেন কেবল তাদের মাযহাবই সঠিক এবং অন্যরা ভুলের ওপর আছেন। ফিকহুল মুকারান অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, অন্য ইমামদের মতামতের পেছনেও শক্তিশালী দলিল রয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মন উদার হয় এবং মাযহাবী গোঁড়ামি দূর হয়।

৩. ইজতেহাদী যোগ্যতা অর্জন (تكوين الملكة الفقهية): ইমামগণের মতামত ও দলীলের প্রয়োগ পদ্ধতি (ইসতিম্বাত) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে শিক্ষার্থীর মেধা শানিত হয়। সে বুঝতে পারে কীভাবে একটি আয়াত বা হাদীস থেকে বিভিন্ন হুকুম বের করা হয়েছে। এই চর্চা তার মধ্যে ভবিষ্যতে ইজতেহাদ করার বা নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা তৈরি করে।

৪. শরীয়তের প্রশস্ততা প্রমাণ: ইসলাম যে কোনো কঠিন ধর্ম নয় এবং এতে যে বিভিন্ন মতের অবকাশ (প্রশস্ততা) আছে, তা প্রমাণ করা এবং উম্মাহর ঐক্যের

পথ সুগম করা এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশ্ন-১৪: আলেমদের মতপার্থক্য অধ্যয়নের একটি উপকারিতা উল্লেখ কর। (اذكر فائدة واحدة من دراسة اختلاف العلماء.)

উত্তর: ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহ মূলত আলেমদের মতপার্থক্য (ইখতিলাফ) নিয়ে আলোচনা করে। এই মতপার্থক্য অধ্যয়নের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকারিতা হলো **"শরীয়তের প্রশস্ততা ও সহজীকরণের সুযোগ সৃষ্টি"।**

উপকারিতার ব্যাখ্যা (شرح الفائدة): ইসলামী শরীয়ত মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাননি। আলেমদের মতপার্থক্য উম্মাহর জন্য 'রহমত' স্বরূপ।

- **সহজ সমাধান (Taysir):** কোনো একটি মাসআলায় এক মাযহাবে হয়তো কঠোরতা (আজিমত) রয়েছে, কিন্তু অন্য মাযহাবে সহজতা (রুখসত) রয়েছে। মতপার্থক্য অধ্যয়নকারী ব্যক্তি কঠিন পরিস্থিতিতে বা 'জরুরত'-এর সময় অন্য মাযহাবের সহজ মতটি গ্রহণ করে উম্মাহকে স্বস্তি দিতে পারেন।

- **উদাহরণ:** হানাফি মাযহাবে অজুর সময় রক্ত বের হলে অজু ভেঙ্গে যায়, কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে ভাঙ্গে না। হজ বা যুদ্ধের ময়দানে কেউ আহত হলে শাফেয়ী মত গ্রহণ করে তার জন্য ইবাদত করা সহজ হয়ে যায়।

ইমামদের উক্তি: খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) বলতেন:

"সাহাবায়ে কেরামের মতভেদ না থাকলে আমি খুশি হতাম না। কারণ তারা মতভেদ করেছেন বলেই আজ আমরা দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা বা ছাড় খুঁজে পাই।"

সুতরাং, মতপার্থক্য অধ্যয়ন করলে মুসলমানরা বুঝতে পারে যে ইসলাম সংকীর্ণ নয়, বরং এটি সব যুগ ও পরিস্থিতির জন্য উপযোগী। এটি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-১৫: তুলনামূলক ফিকহ কীভাবে ইসলামী ঐক্যের সেবা করে? (كيف يخدم الفقه المقارن الوحدة الإسلامية؟)

উত্তর: আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ফিকহী মাযহাবের ভিন্নতা ও তুলনামূলক আলোচনা উম্মাহকে বিভক্ত করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, 'আল-ফিকহুল মুকারান' সঠিক পন্থায় চর্চা হলে তা ইসলামী ঐক্যের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

ঐক্যের সেবায় ভূমিকা (خدمة الوحدة الإسلامية):

১. মৌলিক ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ: তুলনামূলক ফিকহ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, ইমামদের মতভেদ কেবল শাখা-প্রশাখা (ফুরু) বা খুঁটিনাটি বিষয়ে। কিন্তু দ্বীনের মূল বিষয় (উসূল), আকীদা এবং মৌলিক ইবাদতে (যেমন— নামাজ ফরজ হওয়া, কাবামুখী হওয়া) সকল মাযহাব একমত। ফিকহুল মুকারান এই মৌলিক ঐক্যকে সামনে নিয়ে আসে এবং প্রমাণ করে যে, আমরা সবাই একই উৎসের (কুরআন-সুন্নাহ) অনুসারী।

২. ইমামদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রচার: তুলনামূলক ফিকহ আমাদের জানায় যে, ইমাম আবু হানিফা, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) একে অপরকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেও একে অপরের পেছনে নামাজ পড়েছেন। এই ইতিহাস জানার পর মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যকার হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয় এবং ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়।

৩. সহনশীলতা বৃদ্ধি (তাসামুহ): ফিকহুল মুকারান শেখায় কীভাবে দলীলের ভিত্তিতে মার্জিতভাবে দ্বিমত পোষণ করতে হয় (আদাবুল ইখতিলাফ)। একে অপরকে 'কাফের' বা 'ফাসেক' না বলে 'ইজতেহাদী ভুল' হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা তৈরি করে।

৪. সংকট নিরসন: আধুনিক সমস্যা নিরসনে যখন সকল মাযহাবের আলেমরা মিলে 'যৌথ ইজতেহাদ' করেন, তখন তা উম্মাহকে এক পতাকার নিচে নিয়ে আসে। এভাবে তুলনামূলক ফিকহ বিভেদ ভুলে 'এক উম্মাহ' গঠনের পথ দেখায়।

প্রশ্ন-১৬: তুলনামূলক ফিকহের সমৃদ্ধি ও লিপিবদ্ধকরণের যুগ কখন ছিল? (متى كانت مرحلة الازدهار والتدوين في الفقه المقارن؟)

উত্তর: 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে এর সমৃদ্ধি (Izdehar) এবং কিতাব আকারে লিপিবদ্ধকরণ (Tadwin) শুরু হয় ফিকহী মাযহাবগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর।

সমৃদ্ধি ও লিপিবদ্ধকরণের যুগ (مرحلة الازدهار والتدوين): মূলত **হিজরি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী** (৯ম ও ১০ম খ্রিস্টাব্দ)-কে তুলনামূলক ফিকহের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

১. প্রেক্ষাপট: হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাবগুলো গঠিত হয়। এরপর ইমামদের ছাত্রদের মধ্যে ফিকহী বিতর্ক (মুনাযারা) বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকে নিজ মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্য মাযহাবের দলিল খণ্ডন শুরু করেন। এই প্রয়োজন থেকেই তুলনামূলক ফিকহের গ্রন্থ রচিত হতে থাকে।

২. প্রধান সংকলকগণ: এই যুগে এমন কিছু মহান আলেম জন্ম নেন, যাঁরা মাযহাবী গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে মতভেদগুলো সংকলন করেন।

- **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.):** তিনি 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, যা এই শাস্ত্রের প্রথম দিকের লিখিত রূপ।
- **ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী (মৃ. ৩২১ হি.):** হানাফি এই ইমাম 'শারহু মাআনিল আসার' ও 'ইখতিলাফুল উলামা' রচনা করেন, যেখানে তিনি হাদিস ও ফিকহের তুলনামূলক আলোচনা করেন।
- **ইমাম ইবনে রুশদ (মৃ. ৫৯৫ হি.):** পরবর্তী সময়ে তাঁর 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থটি এই শাস্ত্রকে পূর্ণতা দান করে।

সুতরাং, মাযহাব গঠনের অব্যবহিত পরেই হিজরি ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে মুজতাহিদ ইমাম ও তাঁদের ছাত্রদের হাত ধরেই এই শাস্ত্রের বিকাশ ও লিপিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন-১৭: মাযহাবের বহুত্বের প্রভাব তুলনামূলক ফিকহ বিজ্ঞানের ওপর কী? (ما هو أثر التعدد المذهبي على علم الفقه المقارن؟)

উত্তর: 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহ বিজ্ঞানের অস্তিত্বই নির্ভর করে মাযহাবের বহুত্বের (Taddud al-Madhahib) ওপর। যদি ইসলামে কেবল একটিই মত বা মাযহাব থাকত, তবে 'তুলনা' করার মতো কোনো বিষয় থাকত না। সুতরাং, মাযহাবের বহুত্ব এই শাস্ত্রের মূল চালিকাশক্তি।

মাযহাবের বহুত্বের প্রভাব (أثر التعدد المذهبي):

১. শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিষয়বস্তু সৃষ্টি: বিভিন্ন ইমামের ভিন্ন ভিন্ন মতামতের কারণেই গবেষকরা সেগুলো একত্রিত করার এবং তুলনা করার সুযোগ পেয়েছেন। মাযহাবের ভিন্নতা ফিকহুল মুকারানকে গবেষণার উপাদান (Raw Material) যুগিয়েছে।

২. ফিকহী ভাণ্ডার সমৃদ্ধকরণ: প্রতিটি মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও উসূল ব্যবহার করে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান বের করেছে। হানাফিরা 'কিয়াস' ও 'ইস্তিহসান'-এর ওপর জোর দিয়েছে, আবার মালেকী বা হাম্বলীরা 'হাদিস' ও 'আসার'-এর ওপর। এই বৈচিত্র্য ইসলামী আইনকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আইনে পরিণত করেছে।

৩. চিন্তার গভীরতা বৃদ্ধি: মাযহাবের বহুত্বের কারণে ফকিহগণ একে অপরের দলিল খণ্ডন করতে গিয়ে গভীর গবেষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিধান আবিষ্কৃত হয়েছে, যা একক মাযহাবে সম্ভব ছিল না।

৪. সমাধানের বিকল্প পথ: বহুত্বের কারণে মানুষের জন্য বিকল্প পথ খোলা থাকে। আধুনিক যুগে বা কঠিন পরিস্থিতিতে এক মাযহাবের সমাধান কঠিন হলে, অন্য মাযহাবের মত গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করা যায়। এটি ফিকহুল মুকারানের অন্যতম দান।

সুতরাং, মাযহাবের বহুত্ব কোনো সমস্যা নয়, বরং এটি ফিকহুল মুকারানকে একটি গতিশীল ও জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানে রূপান্তর করেছে।

প্রশ্ন-১৮: মধ্যযুগে তুলনামূলক ফিকহের সবচেয়ে প্রধান লেখকের নাম উল্লেখ কর। (اذكر أبرز مؤلف في الفقه المقارن في العصور الوسطى.)

উত্তর: মধ্যযুগ বা ফিকহ চর্চার স্বর্ণযুগে অনেক মনীষী তুলনামূলক ফিকহ নিয়ে কাজ করেছেন। তবে নিরপেক্ষতা, গবেষণার গভীরতা এবং পদ্ধতির অভিনবত্বের কারণে আন্দালুসিয়ার (স্পেন) প্রখ্যাত ফকিহ, দার্শনিক ও বিচারক **ইমাম ইবনে রুশদ আল-হাফিদ (রহ.)** [মৃত্যু: ৫৯৫ হিজরি]-কে এই শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ: তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম **'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্তাসিদ'** (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)।

কেন তিনি প্রধান? ১. মতভেদের কারণ বিশ্লেষণ: তিনি কেবল ইমামদের মত উল্লেখ করেননি, বরং কেন তাঁদের মধ্যে মতভেদ হলো (আসবাবুল ইখতিলাফ), তা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ২. **নিরপেক্ষতা:** মালেকী মাযহাবের অনুসারী ও বিচারক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই কিতাবে মাযহাবী পক্ষপাতিত্ব করেননি। যেখানেই দলিল শক্তিশালী পেয়েছেন, সেখানেই হকের পক্ষ নিয়েছেন। ৩. **মুজতাহিদ তৈরির পাঠশালা:** তাঁর কিতাবটি পড়লে একজন পাঠকের মধ্যে ইজতেহাদ করার বা দলিল থেকে বিধান বের করার যোগ্যতা তৈরি হয়।

অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য লেখক: যদিও ইমাম তাবারী (ইখতিলাফুল ফুকাহা) এবং ইবনে কুদামা (আল-মুগনী) অসামান্য অবদান রেখেছেন, কিন্তু 'তুলনামূলক পদ্ধতি' বা 'ফিকহুল মুকারান'-এর আধুনিক সংজ্ঞার বিচারে ইবনে রুশদ ও তাঁর কিতাবটি অদ্বিতীয় এবং সিলেবাসে বিশেষভাবে পঠিত।

প্রশ্ন-১৯: তুলনামূলক ফিকহে আলেমদের দলীল অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? (ما هي أهمية دراسة أدلة العلماء في الفقه المقارن؟)

উত্তর: 'আল-ফিকহুল মুকারান' বা তুলনামূলক ফিকহের প্রাণশক্তি হলো 'আদিল্লাহ' বা দলিলসমূহ। দলিল ছাড়া ফিকহী মতামত কেবল ব্যক্তিগত ধারণামাত্র। তুলনামূলক ফিকহে আলেমদের দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস) অধ্যয়ন করার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

দলীল অধ্যয়নের গুরুত্ব (أهمية دراسة الأدلة):

১. সত্য ও সঠিক মত নির্ণয় (Tarjih): গবেষকের কাজ হলো বিভিন্ন মতের মধ্যে তুলনা করে শক্তিশালী মতটি গ্রহণ করা। এটি কেবল তখনই সম্ভব, যখন তিনি প্রতিটি মতের পেছনের দলিলগুলো জানবেন এবং যাচাই করবেন। দলিল জানলেই বোঝা যায় কার কথাটি আল্লাহর রাসূলের (সা.) সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী।

২. অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্তি: দলিল না জেনে কারো মত মানাকে বলা হয় 'তাকলীদ' (অন্ধ অনুকরণ)। আর দলিল জেনে মানাকে বলা হয় 'ইত্তেবা' (সচেতন অনুসরণ)। ফিকহুল মুকারান দলিল অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষকে মুকাল্লিদ থেকে মুজতাহিদ বা সচেতন অনুসারীর স্তরে উন্নীত করে।

৩. ইমামদের প্রতি সুধারণা সৃষ্টি: অনেক সময় সাধারণ মানুষ মনে করে ইমামরা নিজেদের মনগড়া কথা বলেছেন। কিন্তু যখন তাদের দলিলগুলো অধ্যয়ন করা হয়, তখন বোঝা যায় যে, তাঁরা কুরআন-হাদিসের বাইরে কিছুই বলেননি। এতে ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে।

৪. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি: যখন কেউ দলীলের ভিত্তিতে আমল করে, তখন তার ইবাদতে প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস আসে। সে জানে যে সে যা করছে, তার ভিত্তি শরীয়তে আছে।

সুতরাং, দলিল হলো ফিকহের আলো। এই আলো ছাড়া তুলনামূলক ফিকহের পথে চলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন-২০: তুলনামূলক ফিকহে অনুসৃত পদ্ধতি কী? (ما هو المنهج المتبع في الفقه المقارن؟)

উত্তর: 'আল-ফিকহুল মুকারান' কোনো এলোমেলো আলোচনার নাম নয়। এটি একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা 'মানহাজ' (Methodology) অনুসরণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এই পদ্ধতি গবেষককে আবেগ বা পক্ষপাতিত্ব থেকে রক্ষা করে।

অনুসৃত পদ্ধতি বা ধাপসমূহ (المنهج المتبع): গবেষক সাধারণত ক্রমানুসারে ৫টি ধাপ অতিক্রম করেন:

১. **তাসভীরুল মাসআলা (মাসআলার চিত্রায়ন):** প্রথমে আলোচ্য সমস্যাটির সংজ্ঞা ও স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়, যাতে পাঠক বিষয়টি বুঝতে পারেন। ২. **তাহরীরু মাহাল্লিন নিযা (বিরোধের স্থান নির্ধারণ):** মাসআলার কোন অংশে সবাই একমত এবং ঠিক কোন পয়েন্টে দ্বিমত আছে, তা নির্দিষ্ট করা হয়। ৩. **আলেমদের মতামত ও দলিল উপস্থাপন:** বিভিন্ন মাযহাবের মতামত তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে উদ্ধৃত করা হয় এবং প্রতিটি মতের সপক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলিল পেশ করা হয়। ৪. **মুনাক্বশা (পর্যালোচনা):** দলিলগুলোর শক্তি-দুর্বলতা যাচাই করা হয় এবং একে অপরের দলীলের ওপর যে আপত্তি ও জবাব (রদ-বদল) দিয়েছেন, তা আলোচনা করা হয়। ৫. **আত-তারজীহ (অগ্রাধিকার প্রদান):** সবশেষে দলীলের প্রবলতার ভিত্তিতে গবেষক নিরপেক্ষভাবে যেকোনো একটি মতকে শক্তিশালী (রাজিহ) ঘোষণা করেন এবং সেটি গ্রহণের পরামর্শ দেন।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করলেই কেবল একটি গবেষণাকে 'তুলনামূলক ফিকহ' বলা যায়। এটি সত্য উদঘাটনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ।

তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার পদ্ধতি

প্রশ্ন-২১: তুলনামূলক ফিকহে গবেষণার পদ্ধতির প্রথম ধাপ কী? (ما هي أول خطوة في طريقة البحث في الفقه المقارن؟)

উত্তর: তুলনামূলক ফিকহ বা 'আল-ফিকহুল মুকারান' একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এলোমেলো আলোচনা ফিকহী গবেষণার মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। এই গবেষণার ধারবাহিক পদ্ধতির সর্বপ্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো **'মাসআলার চিত্রায়ণ'** বা **'তাসভীরুল মাসআলাহ'** (تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ)।

প্রথম ধাপের পরিচয় ও গুরুত্ব: 'তাসভীর' শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর ছবি আঁকা বা রূপরেখা তৈরি করা। গবেষণার শুরুতে গবেষককে আলোচ্য বিষয়টি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয়। যে সমস্যা বা মাসআলা নিয়ে গবেষণা করা হবে, তার প্রকৃতি (Nature), পরিধি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট পাঠকের সামনে তুলে ধরাই হলো এই ধাপের কাজ।

একটি প্রবাদ আছে, **"আল-হুকমু আলাশ শাইয়ি ফারউন আন তাসাওউরিহি"** (কোনো বস্তুর ওপর হুকুম বা বিধান আরোপ করা, সেই বস্তুর স্পষ্ট ধারণার ওপর নির্ভরশীল)। অর্থাৎ, গবেষক যদি সমস্যাটিই ঠিকমতো না বোঝেন, তবে তার সমাধান বা হুকুম ভুল হতে বাধ্য।

উদাহরণ: ধরা যাক, গবেষক 'বিটকয়েন' বা 'ডিজিটাল কারেন্সি'র হুকুম নিয়ে গবেষণা করবেন। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপেই তাকে 'বিটকয়েন' কী, এটি কীভাবে কাজ করে, এর অর্থনৈতিক ভিত্তি কী—তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর তিনি ফিকহী হুকুম খুঁজবেন। এই প্রাথমিক পরিচিতি ও চিত্রায়ণই হলো গবেষণার প্রথম ধাপ বা ভিত্তিপ্রস্তর। এটি ছাড়া পরবর্তী ধাপগুলোতে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন-২২: 'তাসভীরুল মাসআলাহ' (মাসআলার চিত্রায়ণ) বলতে কী বোঝানো হয়? (ماذا يقصد بـ"تصوير المسألة"؟)

উত্তর: তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার পদ্ধতির প্রথম স্তম্ভ হলো 'তাসভীরুল মাসআলাহ'। এটি গবেষণার প্রবেশদ্বার স্বরূপ।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ: আরবি 'তাসভীর' (تَصْوِير) শব্দটি 'সূরাতুন' (صُورَةٌ) বা আকৃতি থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো কোনো কিছুর বাস্তব প্রতিচ্ছবি বা রূপরেখা তৈরি করা। পরিভাষায়, গবেষণাধীন বিষয়টির সংজ্ঞা, স্বরূপ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন পাঠকের মানসপটে সমস্যাটির একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়।

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি: ১. সংজ্ঞা প্রদান: মাসআলাটির আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া। ২. **স্বরূপ বিশ্লেষণ:** সমস্যাটি ইবাদত, মুআমালাত নাকি অন্য কোনো অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত, তা স্পষ্ট করা। ৩. **প্রেক্ষাপট বর্ণনা:** বিশেষ করে আধুনিক সমস্যা (নাওয়াজিল)-এর ক্ষেত্রে সেই বিষয়টির বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি। যেমন— টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে গবেষণার আগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে এর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা 'তাসভীরুল মাসআলাহ'-এর অংশ।

গুরুত্ব: সঠিক চিত্রায়ণ ভুল বুঝাবুঝি দূর করে। গবেষক যদি 'সুদ' (রিবা) এবং 'মুনাফা' (রিবহ)-এর পার্থক্য শুরুতেই চিত্রায়িত না করেন, তবে পরবর্তী আলোচনায় ফকিহগণের মতামত গুলিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে। তাই হুকুম আরোপের আগে বিষয়বস্তুর সঠিক জ্ঞানার্জনই হলো তাসভীরুল মাসআলাহ।

প্রশ্ন-২৩: 'তাহরীরু মাহাল্লিন নিযা' (বিরোধের স্থান স্পষ্টকরণ)-এর অর্থ কী? (ما معنى "تحرير محل النزاع أو الخلاف"؟)

উত্তর: ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক গবেষণার দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত কৌশলগত ধাপ হলো 'তাহরীরু মাহাল্লিন নিযা' (تَحْرِيرُ مَحَلِّ النِّزَاعِ)। এটি গবেষণাকে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক থেকে রক্ষা করে মূল লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে।

শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

- **তাহরীর (تَحْرِير):** অর্থ হলো মুক্ত করা, নির্দিষ্ট করা বা স্পষ্টভাবে লেখা।
- **মাহাল্লুন (مَحَلٌّ):** অর্থ হলো স্থান বা জায়গা।
- **আন-নিযা (النِّزَاع):** অর্থ হলো ঝগড়া, বিবাদ বা মতভেদ। সুতরাং, পারিভাষিক অর্থে এর মানে হলো— আলোচ্য মাসআলার ঠিক কোন

অংশে ফকিহগণ একমত এবং ঠিক কোন পয়েন্টে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে, তা সুনির্দিষ্ট করা।

এর পদ্ধতি: এই ধাপে গবেষক বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন: **১. মাত্তাফাক আলাইহ (ঐকমত্যের স্থান):** মাসআলার যে অংশটুকুতে সকল মাযহাব একমত, তা আলাদা করা। (যেমন— বিতর নামাজ পড়া শরীয়তসম্মত, এতে সবাই একমত)। ২. **মুখতালাফ ফিহ (মতভেদের স্থান):** ঠিক যেখানে দ্বিমত হয়েছে। (যেমন— বিতর কি ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? এই পয়েন্টটিই হলো 'মাহাল্লুন নিযা')। ৩. **গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু:** গবেষক ঐকমত্যের বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা না করে কেবল বিবাদের জায়গাটিতেই তার সমস্ত মনোযোগ ও দলিল নিবদ্ধ করেন।

গুরুত্ব: এটি না করলে গবেষণা এলোমেলো হয়ে যায়। গবেষক হয়তো এমন বিষয়ে দলিল পেশ করছেন যা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। তাই সময় বাঁচাতে ও গবেষণাকে ফোকাসড রাখতে বিরোধের স্থান নির্ধারণ অপরিহার্য।

প্রশ্ন-২৪: তুলনামূলক গবেষণায় মতপার্থক্যের উৎস (মানশা'উল খিলাফ) বর্ণনার গুরুত্ব কী? (ما هي أهمية بيان منشأ الخلاف في البحث المقارن؟)

উত্তর: ফকিহগণের মতভেদ কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ বা খেয়ালিপনা থেকে সৃষ্টি হয়নি। প্রতিটি মতভেদের পেছনেই সূক্ষ্ম কোনো কারণ নিহিত থাকে। এই কারণটি খুঁজে বের করাকেই বলা হয় **'বয়ানু মানশা'ইল খিলাফ'** (بَيَانُ مَنْشَأِ الْخِلَافِ) বা মতপার্থক্যের উৎস বর্ণনা। এটি গবেষণার তৃতীয় ধাপ।

মানশা'উল খিলাফ বর্ণনার গুরুত্ব:

১. ইমামদের প্রতি সুধারণা সৃষ্টি: সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে ইমামরা নিজেদের ইচ্ছামতো ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু যখন গবেষক দেখান যে, "এই মতভেদের কারণ হলো একটি শব্দের অর্থ নিয়ে ভাষাগত ভিন্নতা" অথবা "হাদিসের সনদ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে উসূলি মতভেদ", তখন পাঠকের মনে ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তারা বোঝেন যে, এটি ইজতেহাদী মতভেদ।

২. **গবেষণার গভীরতা বৃদ্ধি:** মতভেদের কারণ জানা থাকলে গবেষক সহজেই বুঝতে পারেন কোন মতটি বেশি শক্তিশালী। যেমন— যদি মতভেদের কারণ হয় কোনো হাদিস এক ইমামের কাছে না পৌঁছানো, তবে হাদিসটি সহীহ প্রমাণিত হলে সেই ইমামের মত দুর্বল হয়ে যায়।

৩. **সমন্বয় সাধনে সহায়তা:** কখনো কখনো মতভেদের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আসলে কোনো বিরোধ নেই; বরং দুজন দুই প্রেক্ষাপটে কথা বলেছেন। এটি জানা একমাত্র 'মানশা'উল খিলাফ' বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

সুতরাং, অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে দলীলের ভিত্তিতে গবেষণার জন্য মতভেদের কারণ জানা অপরিহার্য। ইবনে রুশদ (রহ.) তাঁর কিতাবে এই দিকটিতেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৫: আলেমদের মতামত ও তাদের দলীল বর্ণনায় কী কী অন্তর্ভুক্ত থাকে? (ماذا يشمل بيان آراء العلماء وأدلتهم؟)

উত্তর: তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার মূল শরীর বা কাঠামো হলো আলেমগণের মতামত এবং তাদের দলীল উপস্থাপন করা। এই ধাপটিকে বলা হয় **'আরাউল উলামা ওয়া আদিল্লাতুহুম'** (آرَاءُ الْعُلَمَاءِ وَأَدِلَّتُهُمْ)। এটি গবেষণার চতুর্থ ধাপ এবং এখানেই গবেষণার ব্যাপ্তি প্রকাশ পায়।

এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি: এই ধাপে গবেষককে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে (আমানতদারি) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হয়:

১. **মতামত বিন্যাস (ترتيب الأقوال):** গবেষক মতগুলোকে দল বা গ্রুপ আকারে সাজাবেন। যেমন— "প্রথম মত: যারা বৈধ বলেছেন (হানাফি ও মালেকী)", "দ্বিতীয় মত: যারা অবৈধ বলেছেন (শাফেয়ী ও হাম্বলী)"। মতামত অবশ্যই মূল মাযহাবী কিতাব থেকে উদ্ধৃত হতে হবে, অন্যের মুখের কথায় নয়।

২. **দলীলের উপস্থাপন (سرد الأدلة):** প্রতিটি মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে হবে। দলীলের ক্রমধারা হবে:

- **কুরআন:** আয়াত ও তার তাফসির বা ব্যাখ্যা।
- **সুন্নাহ:** হাদিস এবং তার সনদের মান (সহীহ/হাসান/যঈফ)।

- **ইজমা:** যদি থাকে।
- **কিয়াস ও আকলি যুক্তি:** বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ও ফিকহী কায়দা।

৩. **সঠিক সম্পৃক্ততা (Nisbat):** কোন কথাটি কোন ইমামের বা কোন মাযহাবের, তা সঠিকভাবে উল্লেখ করা। ভুল মাযহাবের নামে ভুল কথা চালানো গবেষণার নীতিবিরোধী।

সারকথা হলো, গবেষক এখানে একজন নিরপেক্ষ বিচারকের মতো সব পক্ষের সাক্ষী ও প্রমাণ (মতামত ও দলিল) আদালতের সামনে (পাঠকের সামনে) হাজির করবেন, যাতে পরবর্তীতে রায় (তারজীহ) দেওয়া সহজ হয়।

প্রশ্ন-২৬: তুলনামূলক ফিকহে মুনাক্বশা (পর্যালোচনা)-এর গুরুত্ব কী? (ما هي أهمية "المناقشة" في الفقه المقارن؟)

উত্তর: দলীল উপস্থাপনের পরেই আসে **'আল-মুনাক্বশা'** (الْمُنَاقَشَةُ) বা পর্যালোচনা ও সমালোচনার ধাপ। এটি গবেষণার প্রাণ। মুনাক্বশা ছাড়া ফিকহুল মুকারান কেবল মতামতের সংকলন (Collection) মাত্র, গবেষণা নয়। সত্য উদঘাটনে এর ভূমিকা অপরিসীম।

মুনাক্বশা-এর গুরুত্ব:

১. **দলীলের মান যাচাই (Test of Evidence):** সব মাযহাবই তাদের মতের পক্ষে দলিল পেশ করে। কিন্তু সব দলিল সমান শক্তিশালী নয়। মুনাক্বশার মাধ্যমে গবেষক যাচাই করেন— হাদিসটি কি সহীহ নাকি যঈফ? আয়াতটি কি মানসুখ (রহিত) নাকি মুহকাম (বহাল)? এই যাচাই-বাছাই ছাড়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব।

২. **আপত্তি ও খণ্ডন (I'tirad wa Jawab):** বিপক্ষ দল অন্যের দলীলের ওপর কী আপত্তি তুলেছেন এবং তার কী জবাব দেওয়া হয়েছে, তা এখানে আলোচিত হয়। যেমন— হানাফিরা শাফেয়ীদের হাদিসের ব্যাখ্যাকে কীভাবে খণ্ডন করেছেন। এই বিতর্কের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে।

৩. **তারজীহের পথ তৈরি:** মুনাক্বশাই নির্ধারণ করে দেয় কোন মতটি দুর্বল (মারজুহ) আর কোনটি শক্তিশালী (রাজিহ)। পর্যালোচনার মাধ্যমে যখন দুর্বল

দলিলগুলো ঝরে পড়ে, তখন গবেষকের জন্য একটি মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া সহজ হয়ে যায়।

সুতরাং, মুনাক্বশা হলো সেই ছাঁকনি, যার মাধ্যমে দলীলের দুধ ও পানি আলাদা করা হয়। এটি গবেষকের পাণ্ডিত্য ও ইজতেহাদী যোগ্যতার প্রমাণ বহন করে।

প্রশ্ন-২৭: 'আত-তারজীহ' (অগ্রাধিকার প্রদান) বলতে কী বোঝানো হয়? (ماذا يقصد بـ"الترجيح"؟)

উত্তর: তুলনামূলক ফিকহ গবেষণার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধাপ হলো **'আত-তারজীহ'** (التَّرْجِيحُ)। দীর্ঘ আলোচনা, দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনার পর গবেষক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাকেই তারজীহ বলে।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

- **শাব্দিক অর্থ:** 'তারজীহ' শব্দের অর্থ হলো পাল্লা ভারী করা বা প্রাধান্য দেওয়া।
- **পারিভাষিক অর্থ:** পরস্পর বিরোধী একাধিক দলীলের মধ্য থেকে কোনো একটিকে শক্তিমত্তার বিচারে গ্রহণ করা এবং অপরটিকে বর্জন বা দুর্বল সাব্যস্ত করা।

তারজীহ-এর প্রকৃতি: যখন গবেষক দেখেন যে, ইমামগণের মতভেদের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দলিল আছে, তখন তিনি শরয়ী মূলনীতির আলোকে বিচার করেন।

- যেই মতের দলিল কুরআন-সুন্নাহর বেশি নিকটবর্তী।
- যেই মতে কিয়াসের চেয়ে নস (Text) প্রাধান্য পেয়েছে।
- যেই মতটি শরীয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন মতকে গবেষক 'রাজিহ' (শক্তিশালী বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত) ঘোষণা করেন এবং বলেন, "আমার গবেষণায় এই মতটিই অধিকতর গ্রহণীয়।"

গুরুত্ব: তারজীহ ছাড়া গবেষণা অসম্পূর্ণ। কারণ গবেষণার উদ্দেশ্য কেবল মতভেদ জানা নয়, বরং আমল করার জন্য সঠিক বিধানটি খুঁজে বের করা। তারজীহ গবেষককে দ্বিধাদ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট আমলের পথ

দেখায়। তবে এই অগ্রাধিকার দেওয়ার অধিকার কেবল যোগ্য গবেষকেরই (আসহাবুত তারজীহ) রয়েছে।

প্রশ্ন-২৮: ইবনে রুশদ-এর তুলনামূলক ফিকহের প্রধান কিতাবের নাম উল্লেখ কর। (اذكر اسم أبرز كتاب في الفقه المقارن لابن رشد.)

উত্তর: ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে আন্দালুসিয়ার (স্পেন) প্রখ্যাত ফকিহ, দার্শনিক ও বিচারক আল্লামা ইবনে রুশদ আল-হাফিদ (রহ.) [মৃত্যু: ৫৯৫ হি.] এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি এই শাস্ত্রের এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আজ পর্যন্ত গবেষকদের নিকট 'মাস্টারপিস' বা আকরগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত।

কিতাবের নাম: তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটির নাম হলো: **'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুক্তাসিদ'** (بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ وَنِهَايَةُ الْمُقْتَصِدِ)

অর্থ ও তাৎপর্য: কিতাবটির নামের অর্থ হলো "মুজতাহিদ বা গবেষকের সূচনা এবং মধ্যমপন্থীর সমাপ্তি"।

- অর্থাৎ, যিনি ইজতেহাদ বা গবেষণার পথে পা বাড়াতে চান, এই কিতাবটি তার জন্য প্রাথমিক গাইড বা সূচনা (বিদায়া)।
- আর যিনি সংক্ষিপ্ত জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চান, তার জন্য এটিই যথেষ্ট বা শেষ সীমা (নিহায়া)।

এটি মূলত মালেকী মাযহাবের প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও এতে হানাফি, শাফেয়ী, হাম্বলী এবং যাহিরী মাযহাবের মতামত ও দলিল অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে এবং ইনসাফের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। তুলনামূলক ফিকহ চর্চাকারীদের জন্য এটি অপরিহার্য পাঠ্য।

প্রশ্ন-২৯: 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' কিতাবের পদ্ধতি কী? (ما هي منهجية كتاب "بداية المجتهد"؟)

উত্তর: ইমাম ইবনে রুশদ (রহ.) রচিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' গ্রন্থটি গতানুগতিক ফিকহী কিতাব নয়। এটি একটি অনন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত,

যা পাঠককে কেবল মাসআলা মুখস্থ করায় না, বরং ফিকহী গবেষক বা মুজতাহিদ হিসেবে গড়ে তোলে।

কিতাবের পদ্ধতি (المنهجية):

১. **উসূল ও ফুরু-এর সমন্বয়:** ইবনে রুশদ কেবল ফিকহী মাসআলা (শাখা) উল্লেখ করেননি। বরং তিনি প্রতিটি মাসআলাকে শরীয়তের মূলনীতি বা উসূলের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মূলনীতি থেকে বিধান বের হয়েছে।

২. **মতভেদের কারণ বিশ্লেষণ (আসবাবুল ইখতিলাফ):** এই কিতাবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো— লেখক কেবল বলেন না যে "কারা কী বলেছেন"। বরং তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন **"কেন তাঁদের মধ্যে মতভেদ হলো"**।

- হাদিসের সনদগত ভিন্নতার কারণে?
- শব্দের অর্থের ভিন্নতার কারণে?
- নাকি কিয়াসের পদ্ধতির পার্থক্যের কারণে? এই কার্যকারণ সম্পর্ক (Causal link) বিশ্লেষণই তাঁর প্রধান পদ্ধতি।

৩. **নিরপেক্ষতা ও ইনসাফ:** যদিও তিনি মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু এই কিতাবে তিনি চরম নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। যেখানে অন্য মাযহাবের দলিল শক্তিশালী মনে হয়েছে, তিনি নিঃসংকোচে তা স্বীকার করেছেন।

সংক্ষেপে, 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'-এর পদ্ধতি হলো— অন্ধ অনুকরণ (তাকলীদ) পরিহার করে দলীলের আলোকে মতভেদের কারণ অনুসন্ধান করা এবং সত্যে উপনীত হওয়া।

প্রশ্ন-৩০: তুলনামূলক ফিকহের একটি আধুনিক কিতাবের নাম উল্লেখ কর। (اذكر كتابا حديثا في الفقه المقارن.)

উত্তর: প্রাচীন যুগের মতো আধুনিক যুগেও আলেমগণ তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রে অমূল্য অবদান রেখেছেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার সিলেবাসের আলোকে এবং সমসাময়িক প্রয়োজন মেটাতে বেশ কিছু কালজয়ী গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

একটি আধুনিক কিতাব: আধুনিক যুগে রচিত তুলনামূলক ফিকহের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হলো: **'আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু'** (الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدِلَّتُهُ)

লেখক ও বৈশিষ্ট্য:

- **লেখক:** সিরিয়ার প্রখ্যাত ফকিহ **ড. ওয়াহবা আয-জুহাইলি (রহ.)**।
- **বৈশিষ্ট্য:** এটি **১১** খণ্ডে সমাপ্ত এক বিশাল বিশ্বকোষ। এতে লেখক প্রাচীন চার মাযহাবের পাশাপাশি সমসাময়িক নতুন সমস্যাগুলোর (নাওয়াজিল) সমাধানও তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। এর ভাষা আধুনিক, প্রাঞ্জল এবং বিন্যাস অত্যন্ত চমৎকার। বর্তমান বিশ্বে ফতোয়া ও গবেষণার জন্য এটি একটি অপরিহার্য রেফারেন্স।

অন্যান্য উদাহরণ (সিলেবাস সংশ্লিষ্ট): সিলেবাসের পাঠ্য বা সহায়ক হিসেবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক কিতাব হলো:

- **'ফিকহুল মুকারান' (الفقه المقارن)** – লেখক: ড. আব্দুল ফাত্তাহ কুববারাহ (রহ.)। এটি তুলনামূলক ফিকহের তত্ত্ব ও প্রয়োগ শেখার জন্য সংক্ষিপ্ত ও চমৎকার একটি বই।

ফিকহী মাযহাবসমূহের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ

প্রশ্ন-৩১: ফিকহী মাযহাবের 'নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ' কী কী? (ما هي "الكتب المعتمدة" في المذهب الفقهي؟)

উত্তর: ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে ফতোয়া প্রদান ও বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সব কিতাব সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি মাযহাবে এমন কিছু বিশেষ গ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোকে ওই মাযহাবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও সঠিক মতের ধারক হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলোকেই পরিভাষায় **'আল-কুতুবুল মুতামাদাহ'** (الْكُتُبُ الْمُعْتَمَدَةُ) বা নির্ভরযোগ্য কিতাব বলা হয়।

নির্ভরযোগ্য কিতাবের বৈশিষ্ট্য: ১. সঠিক মতের সংকলন: এই কিতাবগুলোতে মাযহাবের দুর্বল (যঈফ) বা পরিত্যক্ত (শায) মতগুলো বর্জন করে কেবল শক্তিশালী ও ফতোয়াযোগ্য (মুফতা বিহি) মতগুলো স্থান দেওয়া হয়েছে। ২. **যাচাইকৃত বর্ণনা:** এগুলোর লেখকগণ ছিলেন উচ্চস্তরের ফকিহ ও গবেষক। তাঁরা পূর্ববর্তী ইমামদের বক্তব্যগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই (তাহকিক) করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. **মাযহাবের ভিত্তি:** পরবর্তী যুগের আলেমগণ এই কিতাবগুলোর উদ্ধৃতি ছাড়া কোনো ফতোয়া দিলে তা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

গুরুত্ব: একজন গবেষক বা মুফতির জন্য এই কিতাবগুলো চেনা অপরিহার্য। কারণ, অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবে অনেক সময় ইমামদের নামে ভুল কথা বা জাল ফতোয়া থাকে। যেমন— হানাফি মাযহাবে 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর কিতাবগুলো হলো মূল ভিত্তি। একইভাবে শাফেয়ী বা মালেকী মাযহাবেও নির্দিষ্ট কিছু কিতাব আছে, যেগুলো ছাড়া ওই মাযহাবের সঠিক রূপ জানা সম্ভব নয়। ফিকহুল মুকারান বা তুলনামূলক ফিকহে গবেষণার সময় অন্য মাযহাবের মত উদ্ধৃত করতে হলে অবশ্যই তাদের এই 'নির্ভরযোগ্য কিতাব' থেকেই নিতে হবে।

প্রশ্ন-৩২: হানাফী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদাহরণ দাও। (اذكر مثالا لكتاب معتمد في المذهب الحنفي.)

উত্তর: হানাফি মাযহাব বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ও সুশৃঙ্খল ফিকহী মাযহাব। এই মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে

ফতোয়া প্রদানের জন্য পরবর্তী যুগের (মুতাক্ষিরীন) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাবটির উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো।

কিতাবের নাম: 'রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার' (رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ)। এটি সাধারণ আলেমদের কাছে **'ফতোয়ায়ে শামী'** (فَتَاوَى الشَّامِي) নামে অত্যধিক পরিচিত।

লেখক ও পরিচয়:

- **লেখক:** ১৯শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হানাফি ফকিহ **আল্লামা ইবনে আবেদিন আশ-শামী (রহ.)** [মৃত্যু: ১২৫২ হি.]।
- **ধরন:** এটি মূলত আলাউদ্দিন হাসকাফী (রহ.) রচিত 'দুররে মুখতার' গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা হাশিয়া।

নির্ভরযোগ্যতার কারণ: ১. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: হানাফি মাযহাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে শুরু করে পরবর্তী হাজার বছরের ফকিহদের যত মতভেদ ছিল, আল্লামা শামী সেগুলোকে একত্রিত করেছেন এবং দলীলের ভিত্তিতে ফতোয়ার জন্য চূড়ান্ত মতটি (মুতামাদ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ২. **ফতোয়ার মানদণ্ড:** বর্তমান বিশ্বে হানাফি মাযহাবের যেকোনো ফতোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী বলে গণ্য হয় না, যতক্ষণ না তা 'ফতোয়ায়ে শামী' দ্বারা সমর্থিত হয়। ৩. **সমন্বয়:** তিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর (যেমন— হিদায়া, বাহরুর রায়িক) ভুলভ্রান্তি সংশোধন করেছেন এবং নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন।

সুতরাং, হানাফি ফিকহে গবেষণার জন্য 'রদ্দুল মুহতার' বা শামী হলো চূড়ান্ত আকরগ্রন্থ।

প্রশ্ন-৩৩: মালেকী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদাহরণ দাও। (اذكر مثالا لكتاب معتمد في المذهب المالكي.)

উত্তর: মদিনার ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.)-এর অনুসারী বা মালেকী মাযহাবের ফিকহী ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই মাযহাবের ভিত্তি ও ফতোয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবটির নাম নিচে উল্লেখ করা হলো।

কিতাবের নাম: 'আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা' (الْمُدَوَّنَةُ الْكُبْرَى)।

সংকলক ও পরিচয়:

- **সংকলক:** ইমাম সাহনুন ইবনে সাঈদ আত-তানুখি (রহ.) [মৃত্যু: ২৪০ হি.]।
- **বিষয়বস্তু:** এটি মূলত প্রশ্ন-উত্তর আকারে রচিত। ইমাম সাহনুন তাঁর শিক্ষক ইমাম ইবনে কাসিম (রহ.)-কে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন, আর ইবনে কাসিম ইমাম মালিক (রহ.)-এর মত অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন।

নির্ভরযোগ্যতার কারণ: ১. উম্মুল মাযহাব: মালেকী মাযহাবে এই কিতাবটিকে বলা হয় 'উম্মুল মাযহাব' বা মাযহাবের জননী। হানাফি মাযহাবে 'মাবসুত'-এর যে মর্যাদা, মালেকী মাযহাবে 'মুদাওয়ানা'-এর সেই মর্যাদা। ২. **বিশুদ্ধতম উৎস:** ইমাম মালিকের ফতোয়া জানার জন্য এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মাধ্যম। মালেকী ফকিহদের নীতি হলো, যদি অন্য কোনো কিতাবের সাথে 'মুদাওয়ানা'-এর বিরোধ হয়, তবে মুদাওয়ানা-এর বক্তব্যই প্রাধান্য পাবে। ৩. **ফতোয়ার ভিত্তি:** উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে (যেমন— মরক্কো, তিউনিসিয়া) মালেকী বিচারক ও মুফতিগণ এই কিতাবের ওপর ভিত্তি করেই রায় প্রদান করেন।

এছাড়া পরবর্তী যুগের জন্য **'মুখতাসার খলিল'** (مُخْتَصَرُ خَلِيلٍ) নামক কিতাবটিও মালেকী মাযহাবে ফতোয়ার জন্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-৩৪: 'ফিকহী মাযহাবের পরিভাষাসমূহ' কী কী? (ما هي "مصطلحات المذاهب الفقهية"؟)

উত্তর: প্রতিটি বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু ভাষা ও সংকেত থাকে, যাকে পরিভাষা বা 'ইস্তিলাহ' বলা হয়। ফিকহী মাযহাবগুলোর ক্ষেত্রেও এটি সত্য। ফকিহগণ দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার না করে বিশেষ কিছু শব্দ বা নাম ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থ, বিধান বা ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। এগুলোকেই **'মুসতালাহাতুল মাযাহিবিল ফিকহিয়্যাহ'** (مُصْطَلَحَاتُ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ) বা ফিকহী মাযহাবের পরিভাষা বলা হয়।

পরিভাষার প্রকারভেদ: মাযহাবের পরিভাষাগুলো সাধারণত তিন ধরনের হয়:

১. **ব্যক্তিবাচক পরিভাষা:** নির্দিষ্ট উপাধি দিয়ে নির্দিষ্ট ইমামকে বোঝানো।

- উদাহরণ: হানাফি ফিকহে **'শাইখাইন'** (দুই শাইখ) বললে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফকে বোঝায়। কিন্তু শাফেয়ী ফিকহে 'শাইখাইন' বললে ইমাম নববী ও ইমাম রাফেয়ীকে বোঝায়।

২. **বিধান ও শক্তিমত্তা নির্দেশক পরিভাষা:** কোনো মতের গ্রহণযোগ্যতা বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ।

- উদাহরণ: **'আসাহ'** (অধিকতর শুদ্ধ), **'মুতামাদ'** (নির্ভরযোগ্য), **'মুফতা বিহি'** (ফতোয়াযোগ্য)। এই শব্দগুলো দেখলে বোঝা যায় মাযহাবের সিদ্ধান্ত কী।

৩. **কিতাব বা উৎসবাচক পরিভাষা:**

- উদাহরণ: হানাফি মাযহাবে **'যাহিরুর রিওয়ায়া'** বললে ইমাম মুহাম্মদের ৬টি নির্দিষ্ট কিতাব বোঝায়। মালেকী মাযহাবে **'নস'** বললে ইমাম মালিকের নিজস্ব উক্তি বোঝায়।

গুরুত্ব: এই পরিভাষাগুলো হলো ফিকহী কিতাবের চাবিকাঠি। এগুলো না জানলে গবেষক বা শিক্ষার্থী কিতাবের মর্ম উদ্ধার করতে পারবেন না এবং এক মাযহাবের বিধান অন্য মাযহাবের ওপর চাপিয়ে ভুল করবেন।

প্রশ্ন-৩৫: হানাফী পরিভাষা 'আল-আসাহ'-এর অর্থ কী? (ما معنى المصطلح الحنفي "الأصح"؟)

উত্তর: হানাফি ফিকহের কিতাবসমূহে (যেমন— হিদায়া, কানযুদ দাকায়িক) মতভেদের ক্ষেত্রে **'আল-আসাহ'** (الْأَصَحُّ) শব্দটি বহুল ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

শাব্দিক অর্থ: 'আসাহ' শব্দটি আরবি ব্যকরণে 'ইসমে তাফজিল' বা আধিক্যবাচক বিশেষ্য। এর অর্থ হলো **'অধিকতর শুদ্ধ'** বা **'সবচেয়ে বিশুদ্ধ'**।

পারিভাষিক অর্থ ও তাৎপর্য: হানাফি পরিভাষায়, যখন কোনো মাসআলায় মাযহাবের ইমামগণের (আসহাব) মধ্যে একাধিক মত থাকে এবং সবগুলো মতই

দলীল বা বর্ণনার দিক থেকে 'সহীহ' (শুদ্ধ) হয়, তখন তুলনামূলকভাবে যে মতটি বেশি শক্তিশালী, তাকে **'আল-আসাহ'** বলা হয়।

বিশ্লেষণ:

- 'আল-আসাহ' বলা মানে হলো, এর বিপরীতে যে মতটি আছে, সেটি 'ভুল' বা 'বাতিল' নয়; বরং সেটিও 'সহীহ' (صحيح)।
- কিন্তু দুটি শুদ্ধ মতের মধ্যে দলীলের বিচারে বা যুক্তির বিচারে 'আসাহ' মতটি অগ্রগণ্য।
- **ফতোয়ার বিধান:** মুফতির জন্য নিয়ম হলো, যেখানে 'আসাহ' মত পাওয়া যাবে, সেখানে 'সহীহ' মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া যাবে না। 'আসাহ' মতটিই গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণ: ইমাম কুদূরী (রহ.) কোনো মাসআলায় বললেন "এটি সহীহ", কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার বললেন "ওটি আসাহ"। এমতাবস্থায় 'আসাহ' মতটিই ফতোয়ার জন্য গৃহীত হবে। এটি হানাফি তারজীহ বা অগ্রাধিকারের একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি।

প্রশ্ন-৩৬: শাফি'ঈ মাযহাবে 'আল-মুতামাদ' পরিভাষাটির তাৎপর্য কী? (ما دلالة المصطلح "المعتمد" في المذهب الشافعي؟)

উত্তর: শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহী গবেষণায় ও ফতোয়া প্রদানে **'আল-মুতামাদ'** (الْمُعْتَمَدُ) পরিভাষাটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নির্দেশক। এই শব্দটি মুফতি ও বিচারকদের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।

শাব্দিক অর্থ: 'মুতামাদ' শব্দের অর্থ হলো— যার ওপর নির্ভর বা ভরসা করা হয়েছে (Reliable/Dependable)।

পারিভাষিক তাৎপর্য: শাফেয়ী মাযহাবে 'আল-মুতামাদ' বলতে সেই ফিকহী মতকে বোঝায়, যা মাযহাবের পরবর্তী যুগের (মুতাক্ষিরীন) প্রধান গবেষকগণ যাচাই-বাছাই (তানকিহ) করার পর ফতোয়ার জন্য চূড়ান্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

- মূলত, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্য এবং পরবর্তী ইমামদের (যেমন— ইমাম জুয়াইনী, গাজালী) মতামতের মধ্য থেকে **ইমাম নববী** (রহ.) ও **ইমাম রাফেয়ী** (রহ.) যে মতটির ওপর একমত হয়েছেন, শাফেয়ী মাযহাবে সেটিই 'মুতামাদ' হিসেবে গণ্য হয়।

- পরবর্তী সময়ে ইবনে হাজার হাইতামী ও ইমাম রমলী (রহ.)-এর তাহকিক বা গবেষণাকেও 'মুতামাদ' বলা হয়।

গুরুত্ব: শাফেয়ী মাযহাবের একজন মুফতির জন্য 'আল-মুতামাদ' মতটি জানা ফরজ। যদি কোনো কিতাবে একাধিক মত থাকে, তবে তাকে খুঁজতে হবে কোনটি 'মুতামাদ'। 'মুতামাদ' মত বাদ দিয়ে অন্য কোনো 'শায' (বিচ্ছিন্ন) বা দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া শাফেয়ী উসূলে জায়েজ নেই। এটি মাযহাবের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।